XXSE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা মঙ্গলবার ১১ চৈত্র ১৪২০ কলকাতা

স্বভাব

মহারাষ্ট্র পারে, পশ্চিমবঙ্গ পারে না। মুম্বইয়ে একাধিক গণধর্ষণ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির পরে এই অভিযোগ উঠিয়াছে। অভিযোগ অসংগত নয়, কারণ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধর্ষণের মামলার বিচার চলিতেছে এবং চলিতেছে, দ্রুত নিষ্পত্তি বিরল ব্যাপার। অর্থনীতি ও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে এক রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের তুলনা করা হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক নিয়মেই এ ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি উঠিয়াছে: মহারাষ্ট্র পারে, পশ্চিমবঙ্গ পারে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কোনও একটি ক্ষেত্রে সীমিত নহে। এক দিকে রহিয়াছে প্রশাসনের তৎপরতার অভাব। পার্ক স্ট্রিট বা কামদুনি তাহার দৃষ্টান্তমাত্র। সাধারণ ভাবেই এ রাজ্যে অপরাধের তদন্ত বিলম্বিত লয়ে চলে। চার্জশিট তৈয়ারি করিতে অস্বাভাবিক বেশি সময় কাটিয়া যায়। তাহার পরেও সমস্যার শেষ হয় না— চার্জশিট যথার্থ ভাবে তৈয়ারি না হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কখনও বা তদন্তের ভার অন্য কাহারও হাতে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহার পরিণামে মামলা আরও বিলম্বিত হয়। এই ব্যাধি নূতন নয়, পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের জমানাতেও ইহা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, সে জন্য প্রশাসনের কর্তাদের বহু বার আদালতের তিরস্কারও শুনিতে হইয়াছে।

পাশাপাশি, বিচারব্যবস্থাও অনেক সময়েই যথেষ্ট দ্রুত কাজ করিতে পারে না, মামলা উঠিবার সময় হইতে তাহার নিষ্পত্তির সময় অবধি অস্বাভাবিক দীর্ঘ কাল কাটিয়া যায়। কেন এই বিলম্ব, সেই প্রশ্নের অনেকগুলি উত্তর। এক, যথেষ্ট আদালতের অভাব। দুই, আদালতে যথেষ্ট পরিকাঠামো এবং বিচারকের অভাব। কেবল পরিমাণগত অভাব নয়, গুণগত উৎকর্ষ লইয়াও প্রশ্ন তুলিবার কারণ আছে। তিন, আদালতের কাজকর্মে নানা কারণে বিপুল অবকাশ ও ছেদ থাকিবার ফলে বিচারের জন্য বরাদ্দ প্রকৃত সময়ের অভাব। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট নামক বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া এই সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা গোটা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও করা হইয়াছে। দিল্লি ধর্ষণ কাণ্ডের উত্তরপর্বে ধর্ষণের মামলার বিচারে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। কিন্তু মূল সমস্যাগুলি দূর হয় নাই। নামে 'ফাস্ট' হইলেই আদালত ও তাহার বিচার দ্রুতগামী হইবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই।

প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থা, কাহার জন্য মামলায় কতটা বিলম্ব হয়, তাহার বিচার অপেক্ষা অনেক বেশি জরুরি সমস্যার মূলটি নজর করা। পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও কাজই বিলম্বিত লয়ে চলে। দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই লয়টিতে বাঙালি অভ্যস্ত হইয়াছে। গতির মহিমা এমনই। যেখানে দ্রুত কাজ হয়, দ্রুত কাজ হওয়াই সেখানে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যেখানে কাজের গতি ধীর, সেখানে ওই ধীরগতিই স্বাভাবিক বিবেচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি এই দ্বিতীয় গোত্রে অভ্যস্ত হইয়াছে। 'আজ নহে, কাল'— এই বাক্যটি এই রাজ্যে সর্বাধিক পরিচিত বাক্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আদালতে যে পরিমাণ অবকাশ যাপিত হইয়া থাকে, তাহার পিছনেও এই মানসিকতা কার্যকর। প্রশাসন যে তদন্তের কাজে গড়িমসি করে, তাহাও অনেক সময়েই এই স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রিতার প্রকাশ। তাহার সহিত অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা অন্য ধরনের ব্যাধি যুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কাজ না করিবার সামগ্রিক পরিমণ্ডলে সেই ব্যাধিগুলিও উৎসাহিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে গতি আনিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হইয়াছেন। অপরাধের তদন্তের কাজে গতি বাড়াইবার জন্য তিনি উদ্যোগী হউন। আদালতের কাজ অন্তত প্রশাসনের গাফিলতিতে বিলম্বিত না হয়, তাহা নিশ্চিত করুন। তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গও পারিবে। কাল না হোক, পরশু।

শিক্ষকের শিক্ষা

স্কুল-শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রার্থীদের সাফল্যের হার দুই শতাংশেরও কম। পরিসংখ্যানটি যে লজ্জার, তাহা উপলব্ধি করার জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। এই রাজ্যেও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক প্রার্থীদের সাফল্যের হার এমনই চমকপ্রদ। কিছু কাল আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতামান যাচাইয়ের পরীক্ষায় ৩৫ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্রই এক শতাংশ পাশ করিয়াছিলেন। বর্তমানে আলোচ্য পরীক্ষাটিতে সেই সব প্রার্থীই বসার সুযোগ পান, যাঁহারা উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ এবং কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাথমিক শিক্ষকের ডিপ্লোমা সংগ্রহ করিয়াছেন। উচ্চ-মাধ্যমিকের বিদ্যা কিংবা শিক্ষক-ডিপ্লোমা, কোনওটিই যে তাঁহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় নাই, তাহা স্পষ্ট।

প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ক্লাস লওয়ার জন্যই এই প্রবেশিকা পরীক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার ওই পর্বটি শিক্ষার্থীদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বেই পড়ুয়ারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে, প্রশ্ন করিতে, বিশ্লেষণ করিতে শেখে। মুখস্থবিদ্যা উৎসাহিত করার পরিবর্তে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগাইয়া তোলাই এই পর্বের শিক্ষকদের কাজ। এ জন্যই যোগ্যতাসম্পন্ন, ছাত্রদরদি শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, যাঁহারা পড়ুয়াদের কেবল মুখস্থ করিতে নয়, চিন্তা করিতে, বিচার-বিবেচনা করিতে এবং সিদ্ধান্ত লইতে সাহায্য করিবেন। সে জন্য শিক্ষকদের নিজেদের উপযুক্ত হইতে হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষাটি আয়োজনের গুরুত্ব এখানেই। কিন্তু সেই পরীক্ষায় যদি মাত্র দুই শতাংশ পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হন, তবে প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্য পরিকাঠামোটির কী গতি হইবে? একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, শিক্ষক হইতে উৎসুক পরীক্ষার্থীরা নিজেরাও মুখস্থবিদ্যানির্ভর প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেই অপেক্ষাকৃত সফল। কিন্তু যেখানেই ভাবিয়া-চিন্তিয়া উত্তর করিতে হইবে, বাঁধা গতের বাহিরে কিংবা চেনা ছকের বাহিরে গিয়া উত্তর লিখিতে হইবে, সেখানেই বসিয়া-বসিয়া পেন্সিল কামড়াইয়াছেন।

যাঁহাদের নিজেদের শিক্ষা বহুলাংশে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের উপরেই যদি ন্যস্ত হয় দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলার ভার, তাহার পরিণাম উদ্বেগজনক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বনিয়াদটি নড়বড়ে থাকিয়া গেলে কেবল উচ্চশিক্ষা নয়, রাজনীতি, প্রশাসন সহ সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রই অপরিণত, অনুন্নত থাকিয়া যাইবে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এই সার্বিক অবনমনের চিত্রটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষার দুর্বল বনিয়াদ যে সেই অধঃপাতের অন্যতম কারণ, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। দুর্নীতিপরায়ণ ও অপরাধপ্রবণ রাজনীতিক, ফাঁকিবাজ আমলা, দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসনিক অফিসার, পীড়নকারী পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীদের উচ্ছন্নে যাওয়া কর্মসংস্কৃতি— এ সব কিছুর পিছনেই শৈশব-কৈশোরের অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত প্রাথমিক শিক্ষার অবদান থাকে। যাঁহাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা মিলিতে পারিত, তাঁহারাই প্রয়োজনীয় যোগ্যতামান অর্জনে এই হারে অকৃতকার্য হইলে ভরসা করার মতো বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। পরীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা লইয়া কূটপ্রশ্ন না তুলিয়া বা পরীক্ষাকে অগ্রাহ্য না করিয়া কী ভাবে শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়ানো যায়, নীতিকাররা সে দিকে নজর দিন।

'মোদী ম্যাজিক' মূলত প্রচার, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই

মৈত্রীশ ঘটক ও সঞ্চারী রায়

অর্থনীতির মাপকাঠিকে গুজরাত ভারতের অন্যতম অগ্রসর রাজ্য। কিন্তু, গত এক দশকে এই রাজ্যে এমন কিছুই ঘটেনি, যার জন্য নরেন্দ্র মোদী আলাদা করে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। তাঁর গুজরাত মডেল নিয়ে যে উন্মাদনা চলছে, তা শেয়ার বাজারের প্রত্যাশার বুদ্বুদের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষায় নরেন্দ্র মোদীর অশ্বমেধের ঘোড়া এখনও অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু, তাঁর সমর্থকদের মতোই, তাঁর বিরোধীরাও অদম্য। সমর্থকদের কথায় প্রশস্তিবাচক বিশেষণের ছড়াছড়ি— প্রশাসক হিসেবে তিনি দক্ষ, দৃঢ়, যে কোনও দুর্নীতির অতীত, তাঁর নিজস্ব অর্থনৈতিক প্রশাসনের ভঙ্গিমায় (যার নাম হয়েছে 'মোদীনমিকস') তিনি গুজরাতের কপালে সমৃদ্ধির সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন এবং সর্বভারতীয় মঞ্চে সেই ম্যাজিকের পুনরাবৃত্তির সময় এসেছে। মোদীর বিরোধীরাও সমান সরব। ২০০২ সালের সাম্প্রদায়িক হিংসার প্রসঙ্গটি যদি বাদও রাখি, অরবিন্দ কেজরীবালের ভাষায় মোদীর গুজরাত মডেলটি কিছু বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর জন্যে অবারিত দ্বার পাইয়ে দেবার নীতি বই আর কিছু নয়। গুজরাতের যে আর্থিক বৃদ্ধির হার নরেন্দ্র মোদীর প্রচারের প্রাণকেন্দ্র, সমালোচকরা বারে বারেই বলছেন, সেই বৃদ্ধির ফল অসম ভাবে বণ্টিত হয়েছে, দারিদ্র তেমন কমেনি এবং মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে গুজরাত তার আর্থিক উচ্চতার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারেনি।

মোদীর 'গুজরাত মডেল'কে কে কী চোখে দেখবেন, সেটা অংশত নির্ভর করে দর্শকের নিজস্ব রাজনৈতিক ও আদর্শগত অবস্থানের ওপর। আবার, অর্থনীতির কোন সূচককে কে কতটা গুরুত্ব দেবেন, আর্থিক বৃদ্ধির হারকে বেশি জরুরি মনে করবেন নাকি দারিদ্র দূরীকরণকে, তার ওপরও নির্ভর করছে মোদীর মডেলের গ্রহণযোগ্যতা। কিন্তু, মতাদর্শগত অবস্থানের কথা যদি বাদও রাখি, পরিসংখ্যান কী বলছে? মোদীর শাসনকালে গুজরাতের অর্থনীতি ঠিক কতখানি এগিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে প্রথমে দেশের মোট ১৬টি বড় রাজ্যের দিকে তাকাতে হবে। যে রাজ্যে জনসংখ্যা যত বেশি, সেখানে বিভিন্ন আর্থিক সূচকের মাথাপিছু গড় বাড়ানোর কাজও তত কঠিন। নাগাল্যান্ডের সঙ্গে উত্তর প্রদেশের তুলনা করলে উত্তর প্রদেশের প্রতি অন্যায়ই হবে। কাজেই, সমানে-সমানে তুলনা করা ভাল। তবে, বড় রাজ্যগুলির মধ্যেও যেখানে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, সেখানে সূচকের উন্নতি ঘটানো অপেক্ষাকৃত কঠিন।

অর্থনৈতিক উন্নতির সবচেয়ে পরিচিত সূচকটি দিয়েই শুরু করা যাক— মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার। নরেন্দ্র মোদীর সমর্থকরা বারে বারেই জানিয়েছেন, এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তাঁর আমলে গুজরাতে আর্থিক বৃদ্ধির হার অবশিষ্ট ভারতের চেয়ে দ্রুততর, এবং এই বৃদ্ধির হারই মোদীর অর্থনৈতিক মডেলের শক্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ, এমন দাবি করার লোকের বিন্দুমাত্র অভাব নেই।

এই দাবিতে দুটো বড় গলতি আছে। প্রথমত, শুধু গুজরাতই নয়, এই একই সময়ে মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানাতেও আর্থিক বৃদ্ধির হার অবশিষ্ট ভারতের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু, মহারাষ্ট্র মডেল বা হরিয়ানা মডেল নিয়ে কেউ কথা বলছেন না। দ্বিতীয় কথা, শুধু মোদীর আমলেই নয়, ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকেও গুজরাতে আর্থিক বৃদ্ধির হার অবশিষ্ট ভারতের তুলনায় বেশি ছিল। কাজেই, মোদী গুজরাতের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন, এমন দাবি করতে হলে আরও গভীরে যেতে হবে। দেখতে হবে, অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে গুজরাতের বৃদ্ধির হারের ফারাক তাঁর আমলে বেড়েছে কি না। অন্য কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই ফারাক বেড়েছে কি না, দেখতে হবে। যদি দেখা যায়, মোদীর আমলে গুজরাতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের বৃদ্ধির হারের ফারাক বেড়েছে, এবং একই সময়কালে অন্য কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে তেমন ঘটনা ঘটেনি, একমাত্র তখনই বলা যাবে যে মোদীর মডেল সত্যিই কার্যকর।

১৯৯০-এর দশকে গুজরাতের মাথা পিছু আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮%, জাতীয় গড় ছিল ৩.৭%। একুশ শতকের প্রথম দশকে এই হারদুটি হয়েছে যথাক্রমে ৬.৯% ও ৫.৫%। অর্থাৎ, ১৯৯০-এর দশকের তুলনায় তার পরের দশকে, অর্থাৎ গুজরাতে মোদীর শাসনকালে, গুজরাতে গোটা দেশের গড়ের চেয়ে আয়বৃদ্ধি হয়েছিল সামান্য বেশি হারে— ১.১% বেশির পরিবর্তে ১.৩% বেশি। একে কি উন্নতি বলা চলে? অবশ্যই। এই 'উন্নতি' কি 'মোদীনমিকস' নিয়ে প্রচার ও উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ? একেবারেই নয়। মহারাষ্ট্রের কথা ধরা যাক। ২০০০-এর দশকে আয়বৃদ্ধির অঙ্কে দেশে প্রথম স্থানে আছে রাজ্যটি। ১৯৯০-এর দশকে এই রাজ্যের আয়বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৫%, এবং পরের দশকে তা হয়েছে ৬.৭%। জাতীয় গড়ের চেয়ে মহারাষ্ট্রের আয়বৃদ্ধির হারের ফারাক ০.৮% থেকে বেড়ে হয়েছে ১.১%।

মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে যে তিনটি রাজ্য গত ত্রিশ বছর ধরে দেশের প্রথম তিনটে স্থান দখল করে রেখেছে, সেগুলো হল হরিয়ানা, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র। এই সময়কাল জুড়ে গুজরাত গড়ে চতুর্থ স্থানে থেকেছে। ১৯৮০-র দশক থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমতালিকায় যে রাজ্যগুলি ক্রমে উন্নতি করেছে, সেগুলি এই রকম— মহারাষ্ট্র তৃতীয় থেকে প্রথম স্থানে এসেছে, গুজরাত চতুর্থ থেকে তৃতীয়, কেরল দশম থেকে পঞ্চম এবং তামিলনাড়ু সপ্তম থেকে চতুর্থ। এই রাজ্যগুলি যখন ক্রমে উন্নতি করছিল, তখন একটি রাজ্য সমানে পিছিয়ে পড়েছে। পঞ্জাব। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-র দশকের অত্যন্ত ভাল অবস্থান থেকে ২০১০ সালে পঞ্জাব নেমে এসেছে সপ্তম স্থানে। কাজেই, ভুলে গেলে চলবে না যে কোনও ক্রমতালিকার মতো এখানেও কোনও এক বিশেষ রাজ্যের ক্রমসংখ্যার উন্নতির দুটো কারণ থাকতে পারে— হয় সে রাজ্য নিজে ভাল করেছে, অথবা অন্য কোনও রাজ্য বেশ খারাপ করেছে।

গুজরাত যে দীর্ঘ সময় ধরে মাথাপিছু আয় এবং আয়বৃদ্ধির হার, উভয় অঙ্কেই দেশের সেরা রাজ্যগুলির মধ্যে থাকতে পেরেছে, তার জন্য কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু সেই কৃতিত্ব মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে, কারণ এই রাজ্যদুটিও একই কাজে সফল। অন্য দিকে, মোদীর শাসনকালে গুজরাতের আয়বৃদ্ধির হার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়েছে, এমন কথা বলার উপায় নেই।

এ বার, এই সব এগিয়ে থাকা রাজ্যের পাশাপাশি বিহারের কথা ভাবুন। রাজ্যটি চিরকাল মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হারের তালিকায় একেবারে শেষে থেকেছে। ১৯৯০-এর দশকে বিহারে আয়বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের তুলনায় ২.৭% কম ছিল। ২০০০-এর দশকে তা জাতীয় গড়ের চেয়ে ১.৩% বেশি। কাজেই, আয়বৃদ্ধির অঙ্কে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য কৃতিত্ব যদি কোনও রাজ্যের প্রাপ্য হয়, তবে সেটা নরেন্দ্র মোদীর গুজরাত নয়, নীতীশ কুমারের বিহার।

কেউ দাবি করতেই পারেন, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা বা গুজরাতের মতো এগিয়ে থাকা রাজ্যে আর্থিক বিকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা বা সামান্য উন্নতি করার কাজটি বিহারের মতো সম্পূর্ণ পশ্চাদপদ রাজ্যকে ঘুরে দাঁড় করানোর তুলনায় অনেক কঠিন। হাজার হোক, যে পিছিয়ে আছে তার আরও উন্নতি করার পরিসর বেশি। কিন্তু, একই সঙ্গে অন্য কেউ বলতে পারেন, পিছিয়ে থাকা রাজ্যে উন্নতিসাধনের কাজ বেশি কঠিন, কারণ কাজটা যদি সহজই হত, এত দিনে কেউ না কেউ সেটা করে ফেলতেন। বিহারের সঙ্গে তুলনার ক্ষেত্রে আরও একটা কথা মনে রাখা ভাল— জনসংখ্যার নিরিখে বিহার দেশে তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য। গুজরাত দশম। লেখার গোড়াতেই বলেছি, ছোট রাজ্যের তুলনায় বড় রাজ্যে উন্নতিসাধনের কাজটি কঠিনতর। কাজেই, গুজরাতের তুলনায় বিহারে নীতীশ কুমার দুষ্করতর কাজ করেছেন, এমন দাবি কেউ করতেই পারেন।

এ বার অন্য অর্থনৈতিক সূচকগুলোর দিকে তাকানো যাক। মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে গোটা দেশে কেরলের ধারেকাছে আর কোনও রাজ্য নেই। ১৯৮০ বা ১৯৯০-এর দশকে গুজরাতে এই সূচক সর্বভারতীয় গড় সূচকের তুলনায় ভাল ছিল। ২০০০-এর দশকে গুজরাতের দ্রুত অবনতি হয়েছে এবং এই রাজ্যের সূচক কমে জাতীয় গড়ের স্তরে ঠেকেছে। ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত গুজরাতে আর্থিক অসাম্য জাতীয় গড়ের তুলনায় কম ছিল। নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে তা জাতীয় গড়কে টপকে গিয়েছে।

রাজ্যের মোট জনসংখ্যায় দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের অনুপাতের হিসেবে হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, কেরল, হরিয়ানা, অন্ধ্র প্রদেশ এবং কর্নাটকের মতো গুজরাতও দীর্ঘ দিন ধরেই ভাল অবস্থায় রয়েছে। জাতীয় গড়ের তুলনায় এই রাজ্যগুলিতে দরিদ্র মানুষের অনুপাত অনেক কম। কিন্তু, দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে গত এক দশকে সফলতম দুটি রাজ্য হল তামিলনাড়ু এবং বিহার।

গত তিন দশকে গুজরাতের আয়বৃদ্ধির হার বা মাথাপিছু আয়ের রেকর্ড ভাল, সেটা অস্বীকার করার প্রশ্ন নেই। কিন্তু, মোদীর অর্থনৈতিক মডেলের 'অত্যাশ্চর্য সাফল্য' নিয়ে যে প্রচার চলছে, পরিসংখ্যানের বিচারে তা নিতান্ত ভিত্তিহীন। গুজরাত আর্থিক ভাবে অগ্রসর একটি রাজ্য, যার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, কিন্তু গত দশ বছরে সেখানে নতুন করে এমন কোনও উন্নতি হয়নি, যাতে এই মোদী-উন্মাদনার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। দেশের বর্তমান শাসকদের নিয়ে তিতিবিরক্ত হওয়ার এবং পরিবর্তনের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকার অনেক কারণ আছে। কিন্তু তার থেকে যাঁরা প্রাণপণে আশা করছেন যে মোদী প্রধানমন্ত্রী হলেই ভারতীয় অর্থনীতি তাঁর জাদুস্পর্শে ঘুরে দাঁড়াবে, তাঁরা শেয়ার বাজারের কথা মাথায় রাখতে পারেন। সেই বাজারে চড়া প্রত্যাশার আবহাওয়ায় বুদ্বুদের জন্ম হয়। সেই বুদ্বুদ বাড়তে থাকে। প্রত্যাশার সঙ্গে পরিসংখ্যানের মিল না থাকলে কখনও না কখনও সে বুদ্বুদ ফাটতে বাধ্য। সেটা কিন্তু বড্ড যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা।

গুজরাত আর্থিক ভাবে উন্নত, কিন্তু মোদীর অর্থনৈতিক মডেলের 'অত্যাশ্চর্য সাফল্য' নিয়ে যে প্রচার চলছে, পরিসংখ্যানের বিচারে তা নিতান্ত ভিত্তিহীন।

মৈত্রীশ ঘটক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির অধ্যাপক। সঞ্চারী রায় ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারিক-এ অর্থনীতির গবেষক।

এ বড় সুখের সময় নয়। মধ্যরাতে নয়, দিনেদুপুরে পতাকা বদল হয়। স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা আসমুদ্রহিমাচল তোলপাড় করেন। নাগরিক, দর্শকের ভূমিকায়।

ইহাদেরই হাতে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রকাশ্যে যে-লোকটা গিয়ে হাট-বাজারে অথবা মেলায়
ভোটারের হাতে
ঝকঝকে কারেন্সি নোট গুঁজে দেয়, সে খুবই খারাপ।
অন্য দিকে চলছে অন্য রকমের খেলা।
ভর্তুকির গ্যাস-সিলিন্ডার
বছরে ছ'টার বেশি না-দেবার হুমকি দিয়ে কিছুকাল পরে
ঘাড়ের উপরে নির্বাচন
এসে পড়ামাত্র যারা আগের কথাটা গিলে ফেলে
ভোটারের মন ভেজাতে বলে,
'ছ'টা নয়, ন'টা... আচ্ছা বারোটাই দেব,'
কী বলব তাদের?
গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে ভোটারের মাথা
বিগড়ে যেতে থাকে।
সে ভাবে যে, 'তবু হায় ইহাদেরই' হাতে
ন্যস্ত হতে চলেছে এখন
ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা!
বিড়বিড় করে সে শুধু বলে হায়-হায়!

অবস্থাটা দেখতে-দেখতে মনে পড়ে যায়
বলিতে-চড়ানো
সেই ছাগশিশুর দৃশ্য, হাড়িকাঠে মাথা
ঢোকাবার আগে যে এখন
গতিরন্যথা যে নাস্তি, সেটা বুঝে গিয়ে
নির্বিকার
খাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে শুকনো বেলপাতা।

অবস্থান

শ্রীজাত

চোখ ঝলসায় জবর ঝলক
তোমার জন্যে বাজার তৈরি।
বিনিময়ের দোষ কী বলো?
নিজের মাংসে নিজেই বৈরী।

এই তো সময় বিক্রিবাটার।
সেলাম জানাও বাজারদরকে।
সুযোগ ছিল একলা হাঁটার,
যাচ্ছি না আর সে সব তর্কে।

দাগ মুছিয়ে দিচ্ছে ধুলো—
কীসের শিবির, কীসের পক্ষ...
অবস্থান তো কাপাসতুলো।
যাহা বিরোধ, তাহাই সখ্য।

উচ্চকণ্ঠ এখন মিহি
সময় বুঝে আপনি-আজ্ঞে—
কাদের কাছে জবাবদিহি?
আগের কথা চুলোয় যাক গে।

বরং নতুন কথার ফাঁকে
দিকবদলের নতুন রাংতা—
উনুন সেই উনুনই থাকে,
নুন আনতে ফুরোয় পান্তা।

পথেই তোমায় দিচ্ছে বিধান
লোভ দেখাচ্ছে হাজার জানলা...
একটু দ্বন্দ্ব, একটু দ্বিধা—
আয়না বনাম দাঁড়িপাল্লা।

বোঝাও যায় না এ-উৎসবে
কে দর্শক আর কে দ্রষ্টব্য,
ঠিক করে নাও কোনটা হবে—
সহজ, নাকি সহজলভ্য?

সম্পাদক সমীপেষু

আমেরিকার মেয়েরা কেমন আছেন

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায় ('আমেরিকার মেয়েরা', রবিবাসরীয়, ৯-৩) অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তবে মাত্র এক মাসে আমেরিকান নারী সমাজ সম্বন্ধে পুরোটা বুঝে ফেলা অনেকটা হলিউড সিনেমা দেখে আমেরিকাকে চেনা বা বলিউড মুভি দেখে ভারতকে চেনার মতো হয়ে যায়। কিছু না-বোঝা, কিছু অতিরঞ্জন থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। অবশ্যই আমেরিকার খেলাধুলোর জগৎ প্রবল ভাবে পুরুষশাসিত। সেখানে কোটি কোটি টাকার খেলা, প্লেয়ারদের প্রচুর দাপট, এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুরুষদের হুঙ্কার ও উল্লাস— সব সত্যি কথা। মেয়েরা তাদের সঙ্গে বসে খেলা দেখছে এটা মেনে নিয়ে যে, 'ইট'স আ ম্যান'স গেম'। সে রকমই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, বউ পেটানো, হত্যা করা, সব কথাই সত্যি। অন্যান্য পশ্চিমি দেশে, যেমন ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়াতে বন্দুকের উপর যা নিষেধাজ্ঞা আছে, সেটা আমেরিকাতে নেই। সুতরাং গান ভায়োলেন্স বা বন্দুক নিধন এখানে অনেক বেশি। তা সে প্রেমিক-প্রেমিকা হোক, স্বামী-স্ত্রী হোক, স্কুলের শিশু হোক বা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী হোক। হিংসা এখানে সমাজে প্রবল।

নারী সাম্য বা স্বাধীনতা আমেরিকাতে ষাটের দশক থেকে আত্মপ্রকাশ করে। সেটার প্রথম ঘোষণা বেটি ফ্রিডান রচিত 'ফেমিনিন মিস্টিক' (১৯৬৩)। তিনি প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, আরোপিত মহত্ত্বের আড়ালে মেয়েদের কত বোকা বানিয়ে রাখা হয়। যেমন, নারীর প্রথম কর্তব্য সংসার ও সন্তান। মেয়ে-জন্ম তাতেই সার্থক। কিন্তু তার পর? সেই মহৎ মহিলার স্বামী, সংসার, সন্তান দাঁড়িয়ে গেলে পঞ্চাশ বছর বয়স থেকে তিনি বেঁচে রইলেন কি না, বা ঘরের কোণে মাথা খুঁড়ে মরলেন কি না কে দেখতে আসে?

ব্যাপারটা ভারতীয় মেয়েদেরও খুব চেনা নয় কি? মেয়েরা লেখাপড়া করুক সেটা ঠিক আছে (অবশ্যই শহরের, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের কথা নাই বা ধরলাম), কেরিয়ার গড়তে পারে, কিন্তু সন্তান আনতে দেরি করবে, সেটা তো মারাত্মক অপরাধ। সেটা আজও ভারতীয় সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে আমেরিকাতে এই পঞ্চাশ বছরে মেয়েদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মেয়েরা এখন অনেকেই কেরিয়ারের দিকে নজর দেন। সন্তান আনতে দেরি করেন বা ঘোষণা করার সাহস রাখেন যে, তাঁরা সন্তানহীন বিবাহে বিশ্বাসী। কিছু পুরনোপন্থী মানুষ অবশ্যই মুখ বেঁকান। তবে আমাদের ভারতীয় মহিলাদের মতো প্রতি মুহূর্তে তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হয় না। তাঁরা চাকরি করেই বাবা-মার ছত্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে একা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারেন। তার জন্য

পুরুষ অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না। তাঁরা বাড়িতে যত খুশি বন্ধুবান্ধব আনতে পারেন। সমাজের শৃঙ্খলা পবিত্রতা নিয়ে কেউ এখানে মাথা ঘামান বলে তো শুনিনি। আবার বিবাহবিচ্ছিন্না, সিঙ্গল মাদার হলে তাঁর চরিত্র বিচার করার জন্য পাড়ার দাদা-বউদি বা মাসিমা-কাকিমা উদ্‌গ্রীব নন। তাঁরা যদি বিবাহবহির্ভূত সন্তান পালন করেন, তার চরিত্র খারাপ বলে তাঁকে কেউ বিরক্ত করে না, বা তিনি দত্তক নিলে 'বাঁজা' বা 'কোথাকার কোন রাস্তার ছেলেপুলে' নিয়ে এসেছে শোনার কোনও প্রশ্নই নেই। এখানে একাধিক সন্তান থাকা সত্ত্বেও মা-বাবারা আরও সন্তান দত্তক নিয়ে সমান ভাবে তাদের মানুষ করেন।

আমেরিকাতে এখন পুরুষরা অনেক বেশি ঘরের কাজে হাত লাগান। মেয়েরা আজও বেশিটা সামলান বটে, কিন্তু স্ত্রী অফিস যাওয়ার আগে লাঞ্চ প্যাক করে দেওয়া বা স্ত্রীর ফিরতে দেরি হলে ডিনারটা তৈরি করে রাখা বহুলপ্রচলিত। অন্তত এখনকার অল্পবয়সি আমেরিকান পুরুষদের মধ্যে। স্ত্রী ভাল চাকরি করলে স্বামী বাড়িতে থেকে সন্তান মানুষ করছে, সেটা অনেক দেখা যায়। এটা ভারতীয় সমাজে এখনও ভাবা বেশ কঠিন।

এখানে নারী মানেই নারীর শত্রু নয়, এখানে মেয়েরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা বা তাদের প্রতি বৈষম্য নিয়ে অনেক সচেতন। তবে নিজেদের অধিকার পেতে বা বজায় রাখতে তাদের নিরলস সংগ্রাম করে যেতে হয়।

আমি গত কুড়ি বছরে অন্তত তিন জন মহিলা মেন্টর পেয়েছি যাঁরা আমাকে প্রফেশনাল গ্রোথ-এর জন্যই শুধু অনুপ্রেরণা দেননি, পরামর্শ দিয়েছেন যে, এক জন মেয়ে হিসেবে আমি কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারি। খুব সাধারণ উদাহরণ, কোনও আলোচনার সময় তার বিপক্ষে কিছু বললে বা তার যুক্তি ঠিক ভাবে খণ্ডন করলে আমাকে দেখা হবে একজন মারমুখো, ঝগড়াটে বা আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন মহিলা হিসেবে (যার সমার্থক একটা ইংরেজি গালাগাল ছেলেরা প্রচুর ব্যবহার করে)। কিন্তু একই কথা বলার জন্য এক জন পুরুষ তিরস্কৃত তো হবেই না, বরং তাঁকে 'স্পষ্টবক্তা' বা 'নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত' বলে মনে করা হবে।

এখনও এখানে ব্যবসায়ী মহলে পুরুষপ্রাধান্য বেশি। তবু মেয়েরা চেষ্টা করছে তাতে তাল মিলিয়ে উঠে আসার। বড় কোম্পানি, যেমন পেপসি, আই বি এম, ইয়াহু, জি এম— এই সব কোম্পানির শীর্ষে এখন তাই মহিলাদের দেখতে পাই। এখনও এখানে পুরুষ বা নারীর বেতনে লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়। তবে অনেক সংগ্রামের ফলে আজ সেই ব্যবধান কমার দিকে। আজ আমেরিকাতে কর্মস্থলে যৌন অত্যাচার হলে তার প্রতিকার করার অনেক আইন এবং নিয়মকানুন আছে।

কিছুই সহজে হয়নি। অনেক আইন আদালত, অনেক মিছিল, অনেক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে ধর্ষণ বা যৌন হেনস্থা হলে পুলিশ তার কাজ করে। বিচারব্যবস্থা ধর্ষিতাকে তার ধর্ষককে বিয়ে করার নির্দেশ দেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। কন্যাসন্তান জন্মালে বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে না। কন্যা বা কন্যা ভ্রূণ হত্যা তো ভাবাই যায় না। পণপ্রথা বা বধূ হত্যা সত্যি এদের কাছে এক অতি বর্বর 'এশিয়ান' প্রথা।

শুধু মেয়েদের সমস্যা নয়, আমেরিকাতে সমকামী, উভকামী এবং উভলিঙ্গ মানুষদের অধিকারের জন্যও লড়াই চলছে। আমেরিকানরা একটা কথা বোঝে। সেটা এই যে, অন্যায়, বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব মানুষের সমাজে প্রকৃতির নিয়মেই থাকবে। তবে তা মেনে নেওয়া ঠিক নয়। তাকে সঠিক ভাবে শনাক্ত করা এবং তার অর্থ নিরূপণ করে তার মোকাবিলা করাটা জরুরি।

মেয়েদের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক অবস্থানের নিরিখে তাই আমেরিকান মেয়েরা আমাদের ভারতীয় মেয়েদের থেকে অনেক বেশি স্বাধীন এবং ক্ষমতার অধিকারী।

শ্রীরূপা সরকার।
আয়ওয়া, আমেরিকা